দেশভাগের পর এ পারে চলে আসা অসংখ্য মানুষের স্মৃতিকথা তৈরির অভিনব কাজ চলছে নেতাজি সুভাষ বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিখলেন

কুশল সিংহরায়

১৯৭১। দেশভাগের পর ছিন্নমূল অসহায় পরিবার ওপার থেকে এপারে

জানলায় রোদ আনে বালম ধানের গন্ধ

একটা নদীর চরে বালির ঝিকিমিকি। সুগন্ধী বাতাসের প্রান্তে সিদ্ধ হয় ধান। আছে একটা রংচটা পাউডারের কৌটো। দারিক মোল্লার সিল্যুয়েট।

এ সবই আগুন আর কান্নায় মুছে দিতে দিতে, বিপর্যয়ের মধ্যে যেতে যেতে, কেউ একটা অক্ষয়বৃক্ষের চারা পুঁতে দিয়েছিল ওভারল্যাপিং কাঁটাতারে। সেই আবাদে এখন ধানচারার বুক দিয়ে সীমান্ত। তবে বৃক্ষের শিকড় নেমে গিয়েছে দেশহারাদের দীর্ঘ স্বপ্নে। সেখানে ভাঙা তোরঙ্গ, মাইগ্রেশনের হলদে নথি, ফুটো পয়সা পরস্পরকে দেখে চলেছে কাচের টুকরোর মতো। এই প্রতিবিম্বের সাক্ষী হয়ে থাকতে চাইছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, অনুবাদ, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র। দেশভাগে বাংলার ক্ষতচিহ্নগুলি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে খুঁজে নিচ্ছে তারা। তিন বছর ধরে চলছে দেশ-ছেড়ে-আসা মানুষের স্মৃতির সংগ্রহ। সম্প্রতি তৈরি হয়েছে সেই স্মৃতিকথার সূচি। এতে রয়েছে বিভিন্ন জেলার এমন ৩০০ জনের পরিচয়, যাঁরা এখনও পুরোনো ছায়া জুড়ে জুড়ে ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজশাহির মানচিত্র তৈরি করে নিতে পারেন এই বসতে। আরও মানুষের স্মৃতিকথা শোনা হবে।

সেই ১৯৪৬ সালে খুলনা থেকে হাসনাবাদে চলে আসেন নবতিপর বিমলচন্দ্র ঘরামি। এখন বাড়ি সোনারপুরের রূপনগরে। মামারবাড়ি ছিল বুড়বুড়ে গ্রামে। সেখানে ছিল আট বিঘা জমির প্রশস্ত ভিটেবাড়ি, যার স্মৃতিটাও এখনকার বাসায় হাত-পা মেলে বসার ঠাঁই পায় না। জানলায় রোদ আনে বালম ধানের গন্ধ। তরকারিতে কুমড়োর সালুনের কায়া। তাঁরা ছোট কাঁকড়া পুড়িয়ে খেতেন, তার তাপ লেগে আছে চোখেমুখে। পোড়া, ফাটা অ্যাসফল্টের নীচে এবড়ো-খেবড়ো পথ পড়ে আছে আজও। গোরুর গাড়িতে সওয়ার দত্তপুকুরের নবতিপর হাসিরানি সরকারের ঝাঁকুনি লাগে। যশোরের বলরামপুর-রঘুনাথপুর গ্রামে থাকতেন। একদিন রাতে হঠাৎই ছেড়ে আসতে হয়েছিল পুবের মাটি। তাঁর ভাষায়, 'তিনটি বাক্সে বাসনপত্র, পোশাক পুরে নিই। শাড়ির নীচে গয়না। গোরুর গাড়িতে কালীগঞ্জ থানা। সেখান থেকে বাসে যশোর। রাতে ওই স্টেশনেই মেয়েকে নিয়ে রাত কাটাই।'

যে উঠোনে প্রতি সন্ধ্যায় পিদিম দিতেন, সেখানে দীপাবলির রাতটা এখন কেমন, তা জানার ইচ্ছা হলে পুড়তে-থাকা সাঁকো দেখতে পান বৃদ্ধা। তাতে ছাই হয়ে যেতে থাকে একটা জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট— পাসপোর্ট ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার ছাড়পত্র। ফরিদপুরের সীতারামপুর থেকে ভারতে আসার সময় এই ভুয়ো অনুমতিপত্র দেখিয়েছিলেন আর এক নবতিপর দয়াল সমাজপতি। খুলনা থেকে পেট্রাপোলে পৌঁছোন মালগাড়িতে। এর শান্টিং ইয়ার্ডের পোড়ো শেড থেকে রিটার্ন জার্নির কৌশল জানা নেই তাঁর। তাই নদিয়ার বেতাই থেকে তিনি সীতারামপুরের ট্রেনে চাপতে পারেন না। দারিক মোল্লা, মুজিবুররাও মরীচিকার মতো পরিত্যক্ত কামরার সব জানলায় বসে থাকেন।

রিলের ছবি। শরণার্থীদের দিনলিপি। 'সুবর্ণরেখা'র দৃশ্যে

ওঁদের জন্য, নিজের ভিটে একটিবার দেখার জন্য প্রবীণের হাহাকার ভিডিয়ো সাক্ষাৎকারে ধরে রাখছেন প্রায় ৫০ জন গবেষক, শিক্ষক। প্রকল্পের পোশাকি নাম 'বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি'। দেশভাগ বিষয়ে ডিজিটাল সংগ্রহশালা। ভারতের স্বাধীনতা থেকে বাংলাদেশের উদ্ভবের মধ্যে দেশছাড়া মানুষের স্মৃতির সঙ্গে লেখালেখি ও স্মারক সংগ্রহ করা হচ্ছে। নতুনবাজারের সরস্বতী পুজোর নির্ঘণ্ট থেকে লাবণ্যপ্রভা ধরের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি দেখা যাবে এক ক্লিকে— www.dtcsnsou.in। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো-অডিয়ো বয়ান থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে।

রিয়াল ছবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে ফেরার লাইন

> দয়াল সমাজপতি খুলনা থেকে পেট্রাপোলে পৌঁছোন মালগাড়িতে। শান্টিং ইয়ার্ডের পোড়ো শেড থেকে রিটার্ন জার্নির কৌশল জানা নেই তাঁর। নদিয়ার বেতাই থেকে তিনি সীতারামপুরের ট্রেনে চাপতে পারেন না। দারিক মোল্লা, মুজিবুররাও পরিত্যক্ত কামরার সব জানলায় বসে থাকেন...

তবে শুধুই কয়েকটা মলিন বসন্তের ধারাবিবরণী নয় এই সংগ্রহশালা। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ঈশ্বরদীর কাঞ্চন কর্মকারের তিন কিলোমিটার দৌড়, পদ্মার চরে সারাদিনের অভিযান কি ঐতিহাসিকও নয়? পাক সেনাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এই অলৌকিক সফরের শেষে ছিল নৌকো। বৈঠার ঘায়ে তাঁরা এসে পড়েন জলঙ্গিতে। কেবল এই বৃদ্ধ নয়, আস্ত একটা জাতি ধ্বংসের ফরমান হাতে নিয়ে কীভাবে স্থপতি হয়ে উঠল, তা ধরে রাখা হচ্ছে প্রকল্পে। কেন এই প্রয়াস ছক-ভাঙা? প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর ড. মননকুমার মণ্ডল বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে ইউজিসি-র অর্থসাহায্য পেয়েছিলাম। তারপর আর আবেদন করিনি। অর্থ পেলে এই উদ্যোগকে এমন উন্মুক্ত রাখা যেত না। এখানে যে কেউ গবেষণা ও ক্ষেত্রসমীক্ষায় যুক্ত হতে পারেন। এটা পিপলস্ রিসার্চ প্রজেক্ট।'

ঘোড়ার নালের মতো গৌরাঙ্গ নদীর মুক্তবাহু এ ভাবেই সকলকে কাছে টেনে নিত নারায়ণগাঞ্জের উচিতপুরায়। গ্রামের নওজওয়ান, হিন্দু-মুসলমান সুন্দর দিন কাটাত। তাদের মুখে ছিল গাঙের মিঠা পানির ছাপ। ১৯৪৯ সালে দেশত্যাগী চিত্তরঞ্জন বর্ধনের প্রায় নব্বই বছরের পুরোনো চাহনিতে সেই সভ্যতা জলছবি হয়ে আছে। রহড়া শহরতলি এখনও তার এপিটাফ লিখতে পারেনি। 'দেশ' বললেই এক ভাঙনের ধ্বনি শুনতে পান গল্ফগ্রিনের নবতিপর মায়া চক্রবর্তী। বহুড়া বাদুরতলার মুসলিম পড়শিরা না থাকলে হয়তো নতুন দেশ ও জীবন তাঁর দেখা হত না। তা বলে কি ক্ষতচিহ্ন গুনে দেখেন না কেউ? গুনলেও অনেক তার্কিক দশক পেরিয়ে সে অভিযোগ শুধু বিবৃতি হয়ে রয়ে গিয়েছে। ঢাকার মানিকগঞ্জ থেকে এপারে আসা বেথুয়াডহরির মনোরমা সাহার রংচটা পাউডারের কৌটো, বিয়ের বেনারসি, গোবিন্দসেবার থালা-বাসনও একটা বিবৃতি, এক ইতিহাসের গল্প, যা স্মারক হিসেবে ধরা থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পে। তবে এই গল্পের সীমান্ত নেই, এই ইতিহাসের কোনও ধর্মও নেই— শুধু অক্ষয় শিকড়টি স্বপ্নের আরও গভীরে নামিয়ে আনা ছাড়া।